শান্তিরাম

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

সন্ধ্যার কিছু আগে একখানা ট্রেন ছাড়ে। রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সেখানা দেশের স্টেশনে পৌঁছায়। শান্তিরাম ওই ট্রেনেই বাড়ি যাওয়া ঠিক করিল।

কলে জল আসিয়াছে। ঝর ঝর শব্দে চৌবাচ্চায় পড়িতেছে। চৌবাচ্চাটা মাঝারি, ক্রমশ পুরিয়া আসিল বলিয়া। ভাদ্র মাসের পচা গুমোট, স্নান করিয়া লওয়া ভাল। কাপড় ভিজাইয়া দরকার নাই—গামছা পরিয়া শান্তিরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। এখনও ঝাড়ুদার আসে নাই। এবেলা-ওবেলার উচ্ছিষ্ট ভাত, শাকের চিবানো ডাঁটা, মাছের কাঁটা ঝাঁঝরি ড্রেনের মুখে পড়িয়া জলের স্রোত আটকাইয়াছে, দেখিলে গা কেমন করে কি নোংরা !..কিন্তু এই নোংরা, আঁস্তাকুড়ের মধ্যে আজ সাতটি মাস বাস করিয়াও পয়সা হইল কই? সে সব সহ্য করিতে পারিত যদি হোটেলটা হইতে কিছু পয়সা আসিত।

ভূপেনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঘরের চাবি খুলিল। ঘরটার সামনে চালের বস্তা, ডালের বস্তা, বেগুন পটলের ধামা, শুকনা বিলাতি কুমড়া। আধ নাগরী আখের গুড়—একটা ছোট্ট আড়াইসেরা টিনের অর্ধেক ভর্তি সরিষার তৈল। বাজে হোটেলের মত যা-তা তেল এখানে ব্যবহার করা হয় না, রামগোপাল মিলের মোহন-মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল। কিন্তু এতেও হোটেল চলিল না।

ভূপেনবাবু কলতলায় হাত পা ধুইতে আসিল। কাঁধে গামছা, পায়ে খড়ম। চটির দাম বেশি। বেচারি পঁচিশটা টাকা মাহিনা পায়। ট্রাম কোম্পানির আপিসে কাজ করে। ঘরের ভাড়া দেয় সাড়ে চার টাকা—পাইস্ হোটেল এটা, তবুও ভূপেনবাবুর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে—ঘরভাড়া বাদে এগারো টাকা।

ভূপেনবাবু বলিল—শান্তিরামবাবু, আপনি নাকি আজ চল্লেন?

—না গিয়ে কি করি বলুন। এতদিন তো বেয়ে ছেয়ে দেখলাম। কিছুই যখন হলো না, তখন থেকে লাভ কি, খাবই বা কি?

—কেন আপনাকে এরা রাখবে না?

—আমার পোষাবে না। আমি ছিলাম হোটেলের মালিক, আর এখন ওদের তাঁবে আমাকে সাত টাকা মাইনে আর খোরাকিতে খাটতে হবে। আর ওই যে নিধিরামবাবু, ওঃ, এমন মানুষ যদি দুটি—বল্লাম আর পঁচিশটা টাকা বেশি দাও গিয়ে। দেনার দায়ে না হয় হোটেল বিক্রিই হচ্ছে, তা বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে তোমাদের ভাল হবে! হোক, ভগবান মাথার উপর আছেন। তিনি দেখবেন। কারেই না হয় পড়েছি মশায়, চিরকাল এমন দিন থাকবে না, তাও বলে দিচ্ছি।

—বাড়িতেই এখন থাকবেন?

—দেখি কি হয়! পয়সা যা পেলাম হোটেল বিক্রি করে, তা গেল পাওনাদারেরদেনার পেছনে। মিথ্যে বলব কেন ভূপেনবাবু, আপনি আমার ছোট ভাইয়ের মত, সাতটি টাকা আর রেলভাড়া—এই নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তাতে আর ক'দিন চলবে সেখানে?

হঠাৎ শান্তিরামের মনে পড়িয়া গেল—ধারে হোটেলের জন্য কড়া ও বালতি কিনিয়াছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের গিরীন্দ্র কুণ্ডুর দোকান হইতে। হোটেল বিক্রি হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা আজ কয়দিন জোর তাগাদা চালাইতেছে। খাইতে দেয় না, ঘুমাইতে দেয় না। তাহাদের বিল-সরকারকে আজ সন্ধ্যার সময় আসিতে বলা হইয়াছে। আসিলেই চার টাকা কয়েক আনা তাহাদের দেনা শোধ করিতে যাইবে। তবে বাড়ি যাইবে কি শুধু হাতে? পুঁজি তো সাতটি টাকা।

কাজের কথা নয়। তাহার আগেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। শেয়ালদ স্টেশনে গিয়া গাড়ির জন্য বসিয়া থাকা ভাল। দেড় ঘণ্টা হোটেলে অপেক্ষা করিবার দণ্ডস্বরূপ চার টাকা কয়েক আনা দিতে সে রাজি নয়। নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া সে একখানা ময়লা কাপড় পাতিয়া দু-তিনখানা আধময়লা কাপড় ও জামা, কাঁসার গেলাসটা, পুরানো একজোড়া জুতা, একজোড়া খড়ম, পাটি একখানা—পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। না, এখানে কোনো জিনিস ফেলিয়া গিয়া লাভ নাই। বাড়িতে লইয়া গেলে গৃহস্থ সংসারে কত কাজে লাগিতে পারে।

ছোট্ট টিনের স্যুটকেসটার মধ্যে ধোপার বাড়ি হইতে সদ্য-আসা দুখানি ধুতি এবং একটা ছিটের কাপড়ের পাঞ্জাবি পুরিয়া নিজের গায়ের ময়লা শার্টটা পরিতেছে—রেলে যাইবার সময় ফর্সা জামা গায়ে দিয়া লাভ কি? বিশেষত নিজের বাড়িতেই যখন যাইতেছে সে, কুটুম্ব-বাড়িতে নয়—এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—"শান্তিরামবাবু আছেন?

—কে?

—সেদিনকার সেই আধ টিন সর্ষে তেলের দামটা পাওনা—কাল আসতে বলেছিলেন, কাল দু-দুবার এসে দেখা পেলাম না।

—কত বাকি?

—এক টাকা সাড়ে ন আনা।

শান্তিরামের একবার ইচ্ছা হইল বলে, কাল এসো সকালবেলা। কিন্তু ভূপেনবাবু পাশের ঘরেই রহিয়াছে, ভূপেনবাবু জানে, আজই হোটেল বিক্রি হইয়া গিয়াছে, সে—শান্তিরাম, আজই সন্ধ্যার গাড়িতে দেশে চলিয়া যাইতেছে, আর এখন ফিরিবে না। এ অবস্থায় পাওনাদারকে কি বলিয়া মিথ্যা কথা বলা যায়?

অগত্যা দিতে হইল। সাত টাকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল এক টাকা সাড়ে ন আনা। এ বেড়া-আগুনের জাল হইতে বাহির হইতে পারিলে এখন সে বাঁচে। আবার কোন্ দিক হইতে কে আসিয়া পড়িবে কে জানে?

—চল্লেন তা হলে?

—হেঁ হেঁ, আসি। নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—বাড়ি গিয়ে চিঠি দেবেন কি রকম আছেন, কেমন তো?

—হ্যাঁ, দেব বইকি—দেব না?

বেশ লোক ভূপেনবাবু।

ডান হাতে টিনের বিবর্ণ স্যুটকেসটা, বাম বগলে পুঁটুলি ও ছাতা লইয়া শান্তিরাম হোটেল হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শেয়ালদ-এর মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

নাশপাতি—নাশপাতি—ছেলেদের জন্য কিছু কিনিয়া লওয়া যাক। দু'পয়সা জোড়া! ডাকাত নাকি রে বাবা! দু'পয়সা জোড়া নাশপাতি কে কবে শুনিয়াছে?

দিব্যি আপেলগুলি। কত দর? চার পয়সা জোড়া কেন, পয়সা পয়সা না?

ফলওয়ালা চটিয়া বলিল—বাবু, কৌন জমানা মে আপেল পয়সা পয়সা বিকা?

অনেক দরদস্তুর করিয়া শান্তিরাম ছোট ছোট নাশপাতি দুই পয়সায় জোড়া দরে ছয়টি কিনিল, চার-পয়সায় একজোড়া আপেলও কিনিল। পরিমল নস্য লইবে কিছু, দেশে ভাল নস্য পাওয়া যায় না।

ফলওয়ালাকে পয়সা বাহির করিয়া দিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—এই যে শান্তিরামদা, এ কি, যাচ্ছ কোথায়?বাড়ি নাকি? শান্তিরাম পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদের দেশের (ঠিক গ্রামের নয়) সরোজ মুখুজ্জে। সরোজ এখানে কোনো মেসে থাকে, সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যায়। চাকুরি করে মার্চেন্ট আপিসে। আশি-নব্বই টাকা মাহিনা পায়।

—আর ভাই, বাড়ি চল্লাম—সব উঠিয়া দিয়ে চল্লাম।

—কেন, তোমার সেই হোটেল?

—চালাতে পারলাম কই? চলতো ভাল, পাঁচ ভূতে খেয়ে আর বাকি ফেলে ফেল মারিয়ে দিলে। এক এক ব্যাটার কাছে আট টাকা দশ টাকা বাকি, খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে! উপুড় হাত করবার নামটি নেই। তাগাদা করতে গেলেই আজ দেব কাল দেব। এদিকে আমার পাওনাদারেরা—বাড়িওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদি আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। জোচ্চোরে জায়গা কলকাতা। এখানে কি ভদ্দরলোক আছে?

—কিন্তু শান্তিরামদা, দেশে কতদিন যাওনি বল তো? দেশের অবস্থা জানো? বাড়ি তো যাচ্ছ, বন্যেয় সব ডুবে গিয়েছে—রসময়পুর থেকে নৌকায় চড়বে আর একেবারে তোমাদের গাঁয়ের বটতলায় গিয়ে উঠবে, কলুবাড়ির কাছে। চাল নেই, ধান নেই—সব ডুবেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়া—লোকজনের ভয়ানক কষ্ট। কত বাড়ি ঘর পড়ে গিয়েছে—আর এই দুর্দিনে তুমি যাচ্ছ দেশে? এখন যেয়ো না আমি বলি!

—না গিয়ে কি করি?

—এখানে থেকে পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর। এখানে নানা পথ আছে—দেশে কিছু নেই—এক ভিক্ষে ছাড়া। তাই বা দেবে কে? এখানে থেকে বাড়িতে পয়সা পাঠাও, তাদের উপকার হবে। শুধু হাতে বাড়ি গিয়ে কি করবে? আচ্ছা আসি শান্তিরামদা, আসি।

বন্যার খবর শান্তিরাম কিছু জানে না। বাড়ির চিঠি পায় নাই আজ পনেরো-কুড়ি দিন। চিঠি না পাওয়ার কারণ সে জানে। তিন পয়সা দাম একখানা পোস্টকার্ডের, পাড়াগাঁয়ের লোক নিতান্ত দরকারী খবর দিবার না থাকিলে চিঠি বড় একটা দেয় না। বিশেষত তাহার সংসারের যা অবস্থা। তিনটি পয়সা তিনটি মোহর।

ট্রেন ছাড়িল। বেলা একদম পড়িয়া আসিয়াছে। স্টেশনের সিগন্যালের লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে। গাড়িতে লোক বেশি নাই। শান্তিরাম এককোণে বসিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া মাঝে মাঝে বিড়ি টানিতে টানিতে ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

সরোজ যাহা বলিল, তাহাতে বাড়ি যাইবার উৎসাহ তাহার কমিয়া গিয়াছে। সত্য বটে সে ন-দশ মাস বাড়ি যায় নাই। সে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল, স্ত্রীর শেষ সম্বল বালা দুগাছা বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল কলিকাতায়।

দুইশত টাকার মধ্যে বাড়ি লইয়া ফিরিতেছে পাঁচ টাকা সাড়ে ছ-আনা। অবশ্য এ কয় মাস কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়াছিল বাড়িতে—কিন্তু গত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে আর কিছুই দিতে পারে নাই।

দেশে থাকিতে পয়সা উপার্জনের কোনো পথ সে বাকি রাখে নাই। লেখাপড়া তেমন জানে না বলিয়া চাকুরি জোটে নাই, না-ই বা জুটিল চাকুরি। ব্যবসা করিয়া বড়লোক হওয়া যায়, চাকুরিতে নয়। গুড়ের ব্যবসা, কাঠ চালানির ব্যবসা, তরকারি চালানির ব্যবসা, এমন কি মাছ চালানি পর্যন্ত। কিছুতেই কিছু হইল না। তাই স্ত্রীর বালাজোড়া লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল কোনো একটা ব্যবসা করিতে।

অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল হোটেল খুলিতে। খারাপ কিছু চলে নাই, দুবেলা লোকজন খাইতেছিলও মন্দ নয়।—কিসে কি হইল ভগবান জানেন, খরচে আয়ে আর কিছুতেই কুলায় না এমন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাড়িভাড়া বাকি পড়িয়া গেল তিন মাসের। বাড়িওয়ালা শাসাইল জিনিসপত্র আটকাইয়া ভাড়া আদায় করিবে। মুদির দেনা, কয়লাওয়ালার দেনা, তরকারিওয়ালার দেনা, মাছওয়ালার দেনা, দুধওয়ালার দেনা, ঠাকুরের মাহিনা বাকি, ঝি চাকরের মাহিনা বাকি—হোটেল চলে কি করিয়া?

সর্বস্বান্ত হইতে হইল—সত্যসত্যই সর্বস্বান্ত। এতটুকু সোনার গুঁড়া নাই ঘরে, এই কটি টাকা মাত্র সম্বল। বাড়িতে পা দিলেই চৌকিদারি ট্যাক্সের তাগাদা—সেখানেও মুদির দেনা, গোয়ালার দেনা কোন্-বা দশ পনেরো টাকা না জমিয়া গিয়াছে!

তাহার উপর দেশের অবস্থা যে-রকম শোনা গেল, সব কিছু ডুবিয়া গিয়াছে, জিনিসপত্রের দাম চড়া, ধার মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে এ বাজারে। স্ত্রীপুত্র হয়তো বা উপবাসে দিন কাটাইতেছে। নীরদা কত আশা করিয়া

আছে, পূজার সময় (আর দিন সতেরো বাকি পূজার) স্বামী কলিকাতা হইতে সকলের জন্য নতুন কাপড় এবং টাকাকড়ি লইয়া বাড়ি ফিরিবে!

নীরদাকে একদিনের জন্যও খুশি করিতে পারে নাই সে। বিবাহ করিয়া পর্যন্তঅভাব অভাব—অভাব আর ঘুচিল না কোনোদিন। অদৃষ্ট! তাহার অদৃষ্ট নানীরদার অদৃষ্ট? দুজনেরই।

দেশের স্টেশনে নামিয়া সহযাত্রীদের মুখে শুনিল, পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছানো যাইবে না। মাতুগঞ্জের বড় বিল ভাসিয়া রাস্তার উপর এক কোমর জল—এত রাত্রে নৌকাই বা পাওয়া যায় কোথায়? চিলমারির নবীন কলু তাহার মুদীর দোকানের জন্য কলিকাতায় মাল কিনিতে গিয়াছিল। সে তিন গ্রোস দেশলাই ও দুই তিনটি মিছরির কুঁদো লইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

—এই যে দাদাঠাকুর। কলকেতা থেকে এলেন বুঝি? এই গাড়িতেই এলেন—কই দেখিনি তো! এখন কি করে যাই বলুন তো? একটা লোক নেই ইস্টিশনে। নৌকো থাকবার কথা বলা ছিল, কই কাউকে তো দেখছি নে। আপনিও তো যাবেন, ওদিকেসব জলে জলময়।

একজন কুলি তাহাদের জিনিসপত্র ঝাঁকায় করিয়া লইয়া যাইতে রাজি হইল। কুলিটার মুখে শোনা গেল, স্টেশন ছাড়াইয়া যে বড় মাঠ, কিছুদূর গেলে সেই মাঠের ধারে জেলেদের নৌকা ভাড়ার জন্য মজুত আছে। মাঠ জলে ভাসিয়া সমুদ্রের মত দেখাইতেছে—শুধু বাবলা গাছ ও অন্যান্য গাছপালার খানিকটা করিয়া জাগা আছে মাত্র।

শান্তিরাম অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বলিল—হা নবীন, এ রকম বন্যে তো আমাদের জ্ঞানে কখনও দেখিনি। এ কি হয়েচে, এ যে চেনা যায় না কিছু! গাঁয়ের মধ্যে জল ঢুকেছে নাকি?

বাড়ি পৌঁছিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শান্তিরাম ছোট ছেলের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে নীরদা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দোর খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিল। রং ফর্সা, রোগা চেহারা, শান্তিরামের অপেক্ষা সাত বছরের ছোট সুতরাং বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হইয়াছে। মাথার চুল সামনের দিকে অনেক উঠিয়া গিয়াছে। মুখের লালিত্য অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। পরনে লাল পাড় ময়লা শাড়ি; চুলবাঁধা বা পরন-পরিচ্ছদের মধ্যে এতটুকু পারিপাট্য নাই। অতিরিক্ত পান দোক্তা খাইয়া দাঁতগুলি কালো।

—এত রাত্তিরে কোন্ গাড়িতে এলে ! দাও ওগুলো আমার হাতে। বাবা, একখানা চিঠি না পত্তর না—ভেবে মরছি। সতুর আজ আবার তিন দিন জ্বর আর পেটের অসুখ—বুলুর একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ভাবছি আজকালের মধ্যে একখানা পত্তর দেব। তার ওপরে চারিদিকে জল! হাটবাজার করে এনে দেবার লোক পাচ্ছিনে, এই জল পেরিয়ে কে আমার জন্যে চিলেমারি থেকে জিনিস কিনে এনে দেবে! এলে বাঁচলাম—কি আতান্তরে যে পড়েছি—তার ওপর এদিকে হাতে—ও বুলু, কি বলছে শোন, এই যে যাই—চেঁচিয়ো না, কে এসেচে দ্যাখ্—

তোমার শরীর ভাল আছে? এই এত আপেল আর নাশপাতি আছে, সতুকেবুলুকে দাও। খুকিকে দাও এই লেবেঞ্চুস—কলা আর কমলালেবুর। খুকি ভাল আছেতো? চল ঘরে—

—দাঁড়াও একটু, আলোটা জ্বালি, ঘরে অন্ধকার। সামনেই সব শুয়ে আছে, মাড়িয়ে চটকে দেবে।

খানিক পরে শান্তিরাম সুস্থ হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেহ আপেলের টুকরা কেহ লেবেঞ্চুস খাইতেছে। নীরদা স্বামীর জন্য ভাত চড়াইতে গিয়াছে রান্নাঘরে।

নীরদা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে, সে না জানি কত টাকা লইয়াই ঘরে আসিয়াছে। নীরদাকে কিছু বলা হইবে না এখন। না বলাই ভাল। মিথ্যা আশায় রাখিয়া লাভ কি! নীরদার মুখে আনন্দ ও উৎসাহ যেন ধরিতেছে না। কষ্ট হয় বলিতে—নীরদা, যা ভাবছো তা নয়, আমার হোটেল বিক্রি করে দিয়ে চলে এলুম। সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে, তোমার সে বালা গিয়েছে, তার টাকা গিয়েছে। পাঁচ টাকা সাড়ে ছ আনা মাত্র হাতে অবশিষ্ট আছে।

এ কথা বলিতে কষ্ট হয়। নীরদাকে কোন্ সুখটা দিয়াছে জীবনে সে?

নীরদা ভাত চড়াইয়া দিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিল। বলিল—পুজোর আগে আবার যাবে বুঝি! তা এই যাবে আবার আসবে, মিছিমিছি পয়সা খরচ। একেবারে আর দুদিন দেরি করে পুজো পর্যন্ত থেকে যাও। ওদের কাপড়-চোপড় এনেছ নাকি?

শান্তিরাম একবার ভাবিল বলে নীরদা, কিছু নেই, সব গিয়েছে। তোমার বালা জোড়াটাও। সব উঠিয়ে দিয়ে এলাম। হাত একেবারে খালি! পুজোর কাপড়-চোপড় তো দূরের কথা, তোমাদের খেতে দেবো যে কোত্থেকে তাই ভেবে—

তবুও আজ আট মাস পরে বাড়ি আসিয়া তাহার কি ভালই লাগিতেছিল। কলিকাতায় হোটেল খুলিয়া থাকা—সে এক অন্য ধরনের জীবন। এই কয় মাসে সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। কখনও যে ঘরছাড়া হয় নাই তাহার পক্ষে একা ওভাবে নির্বান্ধব স্থানে থাকা কি ভাল লাগে? এ তাহার নিজের বাড়ি—সকলে এখানে আপন। এখানে নীরদা আছে, সতু, বুলু, খুকি, পিসিমা। পাশের বাড়িতে দুর্গাদাস কামার, নিতাই কামার—এরা সব তাহার আপন। নিতাই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া শেখে নাই—পৈতৃক বৃত্তি দা-বাঁধানো, লাঙলের ফাল-পোড়ানো অবলম্বন করিয়াছে। তাহাকে সে যে কত দিন দেখে নাই! নিতাই কামারের দোকানঘরের জামরুলতলার ছায়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিতাই এবং কামার-দোকানের সমাগত লোকজনের সঙ্গে বেগুন কুমড়ার গল্প করিতে কি সুখ! তার তুলনায় হোটেল? কাল নিতাইয়ের সঙ্গে সকালেই দেখা করিতে হইবে।

শান্তিরাম খাইতে বসিল।

—হ্যাঁ গা, পুজো পর্যন্ত থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

—তা কাপড়জামা ওদের কলকাতা থেকে আনলে না কেন? ওখানে দর বেশি?

—দর? হ্যাঁ, তা বেশি।

—হোটেল দেখাশোনা করবে কে এখন?

শান্তিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল নেই।

নীরদা বিস্ময়ের সুরে বলিল—নেই! তবে অন্য কি—কেন, এই সেদিনও তো চিঠি লিখলে হোটেলের কাজ চলছে ভাল।

শান্তিরাম বলিল—চলছিল তো ভালই। তারপর কিসে থেকে কি হলো, কেবল দেনা বাড়তে লাগলো। বিক্রি হয়ে গেল দেনার দায়ে।

—সে বালা-জোড়াটা আছে তো? এনেছ সঙ্গে তো?

নীরদা এই ধরনের প্রশ্ন করিয়া বড় বিপদে ফেলে। এই ধরনের প্রশ্ন না করিয়া যদি বলিত—"সে বালা দুগাছাও ঘুচিয়ে দিয়েছ তো?" তাহা হইলে উত্তর দেওয়াটা সহজ হইত যে বালা ঘুচিয়া গিয়াছে। মিটিয়া গেল। এতখানি আশা-ভরা প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে এখন—

না, সংসার করা এত বিপদ জানিলে সে বিবাহ করিত না। বিবাহ সে ইচ্ছা করিয়া করেও নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রবধূর মুখ দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় উনিশ বছরের ছেলে শান্তিরামের বিবাহ দিয়া যান বারো বছর বয়সের নীরদার সঙ্গে।

—ইয়ে, বালা কোথায় নীরদা? বালা বিক্রি করেই তো হোটেল খুলেছিলাম।

নীরদা হঠাৎ নিজের গালে চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—ওমা আমার কি হবে, ওমা আমার কি হবে—

শান্তিরাম বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, কি ছেলেমানুষি কর—থামো—

ছেলেমেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল।

শান্তিরামের ভাত খাওয়া হইল না—সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া নীরদার হাত ধরিল। স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া 'গল। নীরদাকে শান্ত করিতে শান্তিরামের সময় লাগিল। মেয়েমানুষকে বোঝান দায়। অনেকক্ষণ পরে নীরদা কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া বলিল—তোমার খাওয়া হলো না—আর দুটি ভাত আছে, বেড়ে নিয়ে আসি—

—না, না, থাক। শোয়া যাক এখন। রাত হয়েছে বারোটা কি একটা—

শান্তিরাম স্ত্রীর প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে—একজোড়া বালা না হয় গিয়াছে, তা বলিয়া সে খাইতে বসিয়াছে আর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ছিঃ, এর নাম সংসার? একটু সান্ত্বনার কথা নাই, সহানুভূতি নাই! আচ্ছা সন্ন্যাসী হইয়া গেলে কেমন হয়? অনেকে তো যায়। সংসার আর ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠিকই বলিয়াছেন—কামিনী কাঞ্চন অসার। তাহাদেরই গ্রামের পাশে বন্দিপুরের মুখুজ্জে বাড়ির বড় ছেলে রাধাকান্ত বহুদিন আগে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিল—এখন কি একটা বেশ বড় গোছের নাম লইয়া কাশীতে মঠ করিয়া আছে।বহু শিষ্য সেবক। দুধ ঘি খায়, কোনো কষ্ট নাই—পায়ের উপর মোহর প্রণামী। দিব্যি আছে। আর সংসার করিলে তাহারও দশা এই রকমই হইত—ছেলেপিলে লইয়া জড়াইয়া মরিতে হইত একদিন।

কামিনী কাঞ্চন সত্যই অসার!

নীরদাও স্বামীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বালাজোড়াটা একমাত্র সম্বল ছিল। এই তো সংসারের ছিরি! তাহার বাবার দেওয়া বালা। শ্বশুরবাড়ি?...তাহা হইলে ভাবনা থাকিত না! এক কুচো এখানকার সোনা কোনোদিন অঙ্গে ওঠে নাই। কি বিবাহই দিয়াছিলেন বাবা! অকর্মণ্য—আসল কথা এই যে অকর্মণ্য স্বামী। কত পুরুষ মানুষ কত কাজ করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে, গরিব অবস্থা হইতে বড় লোক হইতেছে। আর তাহার স্বামী যাহা ঘরে আছে বা ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি আসিয়া বসিল। বড়লোক হইতে সে চায় না। কিন্তু এই দুর্বৎসরের বাজারে ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে হইবে তো? এমন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। বিবাহের শখ আছে, স্ত্রীপুত্র পুষিবার ক্ষমতা নাই।

শেষরাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল, ফুটা ছাদ দিয়া নানাস্থানে জল পড়িতে লাগিল। নীরদা ছেলেমেয়েদের লইয়া সরিয়া বিছানা পাতিল, স্বামীর মশারি ভিজিতেছিল দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। শান্তিরাম কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল—আঃ, কি?

—মশারি ভিজছে—ওঠো একটু। বৃষ্টি এসেছে বড্ড।

নীরদা মশারি খুলিয়া কোণের দিকে লইয়া গিয়া আবার খাটাইতে লাগিল। শান্তিরাম বিরক্তমুখে বিছানায় বসিয়া ছিল, কেরোসিনের টেমির মৃদু আলোয় নীরদার দিকে চাহিয়া দেখিল—নীরদা দেখিতে যেন বুড়ি হইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে। বিবাহের পর প্রথম কয়েক বছর কি সুন্দর ছিল দেখিতে! সে রং, সে চেহারা কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ভোজবাজির মত উড়িয়া গেল।

ঠিক তেমন ভালবাসাই কি এখন আছে? সে আকুলি-বিকুলি ভাব, না দেখিলে বাঁচি না ইত্যাদি—বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

নীরদা মশারি খাটাইতেছে। সামনের কপালখানা মাঠের মত চওড়া হইয়া গিয়াছে চুল ওঠার দরুন, ময়লা শাড়িখানাতে চেহারা আরও খারাপ দেখাইতেছে। যেন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েই নয়। ফর্সা একখানা কাপড় পরিলে কি হইত?

শান্তিরামের মনে স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ কেমন অনুকম্পা জাগিল। বেচারি নীরদা!

তাহারই দোষে নীরদা অমন হইয়া গিয়াছে। মেয়েমানুষ অসহায়, যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে। পরাও না শান্তিপুর ফরাসভাঙার জরিপাড় শাড়ি, চড়াও নামোটরগাড়িতে? এমন চড়িবে যখন, সাজসজ্জাও করিবে তখন। উহার দোষ কি?

না—কাল উঠিয়া কোনো একটা চেষ্টা-চরিত্র দেখিতে হইবে। হাত-পা হারাইলে চলিবে না!

নীরদা বলিল—পান দেব, পান খাবে?

—না, এক গেলাস জল বরং দাও। তামাকের পাত্রটা কোথায় রেখেছ?টিকেগুলোতে জল না পড়ে!

—তামাক খাবে নাকি? সাজবো?

—থাক, তুমি জল দাও। তামাক আমি সাজছি।

তামাক টানিতে টানিতে শান্তিরাম বলিল—এখানে আর দেনা কত হয়েছে?

—তা পনেরো-ষোল টাকা কেষ্টর দোকানে বাকি পড়েছে। রোজ তাগাদা করে, বলেছিলাম পুজোর সময় বাড়ি এলে একেবারে নিয়ো—

—পনেরো-ষোল টাকা! এত ধার জমলো কি করে?

নীরদা একটু ঝাঁজের সহিত বলিল—জমবে আর কি করে! চার মাস যে বাড়িতে উপুড়-হাত করোনি সে কথা মনে আছে? চালাচ্ছি কি করে তবে? তবুও আমার কথায় চাল ধার দেয়—নইলে পাড়ায় ধার দেওয়া দোকান থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

এই কথাটিতে শান্তিরামের দুর্ভাবনা আবার বাড়িয়া গেল। একটা টাকা যাহার কাছে একটা মোহর বর্তমানে, তাহার মুদীর দোকানে পনেরো-ষোল টাকা বাকি! না শোধ করিলে অবশ্যই চলে এবং চলিতও। কিন্তু বর্তমানের অসহায় অবস্থায় দোকান হইতে ধারে জিনিসপত্র না লইলে চলিবে না। এবং লইতে গেলেই পূর্বের দেনার কিছু অংশ শোধ করিতে হইবে।

নীরদা বলিল—শুয়ে পড় এখন। ভেবে আর কি হবে। যা হবার হবে।

নীরদার এ কথাটা আবার শান্তিরামের বেশ লাগিল। নীরদার মনে ভালবাসা আছে। দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, নীরদার মুখখানা দেখিলে তবুও যেন অনেকটা শান্তি।

নীরদা বলিল—ওগো শোন, তোমাদের গাঁয়ে পশুপতি মুখুজ্জে কে ছিল? পুকুরধারের ওই যে বড় দোতলা বাড়িটা?ও তো আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত পড়েই আছে ওই ভাবে। ওই বাড়ির লোক এসেছে, আজ পুকুরের ঘাটে দেখি গাড়ি করে নামলো। একজন ছোকরা, এক ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে, এক বুড়ি বোধ হয় ওদের মা—মেয়েটা আইবুড়ো, বেশ দেখতে। ওরা পশ্চিমে থাকতো না?

শান্তিরাম বলিল—পশুপতিদাদার বাড়িতে? তা হবে। পশুপতিদাদা তো মারা গিয়েছেন আজ সাত-আট বছর। তাঁর ছেলে শুনেছি ইঞ্জিনিয়ার। এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। লখনৌ না কানপুর কোথায় থাকে।

—কোনো জন্মে তো আসতে দেখিনি। বাড়িটা তো ভাঙাচোরা, থাকবে কি করে ও বাড়িতে?

পরদিন সকালে শান্তিরাম বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—কাকা চিনতে পারেন?

শান্তিরাম বুঝিল এটি পশুপতি মুখুজ্জের ছেলে, যাহার কথা রাত্রে হইয়াছিল।বলিল—এসো বাবা, এসো। তোমার খুড়িমা বলছিলেন তোমরা কাল এসেছ। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্টই—আহা পুণ্যাত্মা লোক—তোমাদের রেখে স্বর্গে চলে গিয়েছেন—বসো বাবা, বসো। বৌদিও এসেছেন নাকি?

—না, মায়ের শরীর ভাল না। সঙ্গে এসেছেন আমার এক সম্পর্কে মাসিমা। আমি কখনও গাঁয়ে আসিনি—কাউকে চিনি নে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্চি। দেখুন, এই বাপঠাকুরদার দেশ। অথচ কাউকে চিনি নে। বাড়িটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে। কাল সারা রাত্তির বিছানায় জল পড়েছে। সঙ্গে আমার বোন আছে—ওকেও নিয়ে এলাম, এবার ম্যাট্রিক দেবে। কলকাতায় মামার বাড়ি থেকে পড়ে।

—বেশ বেশ, খুব ভাল বাবা। যাবে আসবে বই কি। তোমরা গাঁয়ের রত্ন, না এলে গেলে কি হয়?দেখছ তো গাঁয়ের অবস্থা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সব থাকতে, আমরা কি কষ্টটা পাচ্ছি দেখ গাঁয়ে থেকে। তোমার নামটি কি বাবা?

যুবক বলিল—আজ্ঞে আমার নাম সুশান্ত। আমার বোনের নাম চিন্ময়ী, চিনু বলে ডাকে। আপনার কাছে যে জন্যে এলাম তা বলি। বাবা আমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাদার নামে গাঁয়ে একটা পুকুর কেটে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। আজ সাত বছর বাবা মারা গিয়েছেন, কিন্তু নানা কারণে আমার গাঁয়ে আসা ঘটেনি। তাই এবার ভাবলুম—যাবই। কাজটা সেরে আসি। আমাদের বাড়ির সামনে যে পুকুরটা রয়েছে, ও তোএকেবারে মজা। ভাবছি ওটাকে কাটাবো। পাড়ার লোকের জল খাওয়ার সুবিধে হয় তা হলে। তা ও-পুকুরে আপনার অংশ আছে শুনলাম। আমি অন্য সব অংশীদারের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁরা সব রাজি হয়েছেন। এখন আপনি যদি—আমি অবিশ্যি ন্যায্য দাম যা হয় দেব, সকলকেই দেব।

শান্তিরাম বলিল—এ আর কি বাবা, খুব ভাল কথা। তোমার খুড়িমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে ওবেলা কি কাল যা হয় বলব।

যুবক চলিয়া গেল। শান্তিরাম স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—শোন, শোন। একেবারে অকূল পড়েছি ভাবছিলাম, একটা কূল দেখা গিয়েছে—

তারপর পুকুরের ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বলিল—মজা এঁদো পুকুর পড়ে আছে শ্যাওলা হয়ে। কখনও কিছু তোহয় না। যা পাও, পঁচিশটে টাকাও দেবে। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। ভালয় ভালয় চুকে গেলে পাঁচ পয়সার হরিলুট দিয়ো।

দুপুরের পর পশুপতি মুখুজ্জের মেয়েটি শান্তিরামের বাড়ি বেড়াইতে আসিল। নীরদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাকিমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

নীরদা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েটিকে চিবুক ছুঁইয়া আদর করিয়া বলিল, এসো মা আমার, এসো বসো। গরিব কাকার বাড়ি, তোমায় মা কোথায় বসাই—এ আসনখানাতে বসো মা।

দুজনে ভাবসাব খুব শীঘ্রই হইয়া গেল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সারা দেহে একটা গতির হিল্লোল, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একরাশ চুল, একটু নামাইয়া এলানোখোঁপা-বাঁধা—সাদাসিধা ধরনের শাড়ি ব্লাউজ পরনে। হাসি ছাড়া যেন কথা কহিতে পারে না মেয়েটি।

নীরদা বলিল—তোমার দাদা এসেছিল ওবেলা তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম বড় ভাল ছেলেটি। তুমি ইস্কুলে পড় শুনলাম, কি পড়?

—ক্লাস টেন্-এ পড়ি। এবার ম্যাট্রিক দেব।

—তোমার মা এলেন না কেন? কখন দেখিনি তাঁকে।

—তাঁর শরীর ভাল না। বিছানা থেকে উঠলে মাথা ঘোরে—কোথাও বেরুতে পারেন না।

—আহা! তাঁর দেখাশুনো কে করে? তোমার দাদার বিয়ে হয়েছে?

—না, দাদা বিয়ে করবে না এখন। দেশসেবা করবে, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের লেখাপড়া শেখাবে—এসব দিকে মন। দেশের কাজ করবে বলে পাগল। অন্য ধরনের মানুষ দাদা।

দাদার কথা বলিবার সময় মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় নম্র হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে ইহার মুখের চেহারা যেন বদলাইয়া যাইতেছে। ভারি জীবন্ত চোখমুখ—এসব পাড়াগাঁয়ে নীরদা কখনও এমন মেয়ে দেখে নাই।

অনেকক্ষণ বসিয়া এগল্প ওগল্প করিবার পর মেয়েটি উঠিতে চাহিলে নীরদা বলিল—চিনু মা, গরিব কাকিমার বাড়ি এসেছ যদি, কিছু না খেয়ে তো যেতে পারবে না। তুমি বসো, আমি একটু হালুয়া করে আনি—

চিনু বলিল—মুড়ি নেই কাকিমা? মুড়ি খেতে বড় ভালবাসি।

নীরদা তাড়াতাড়ি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—তুমি কি মুড়ি খেতে পারবে মা, সেই জন্যে দিতে ভরসা করিনি। আমি নিজে মুড়ি ভাজি—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল মুড়ির ধান ফুরাইয়াছে, অথচ কিনিবার পয়সা নাই। আর দুদিন পরে চিনু আসিলে তাহাকে মুড়ি দিবার সামর্থ্য পর্যন্ত থাকিত না। মানসম্ভ্রম কি করিয়া বজায় থাকে যে সংসারে—পুরুষ মানুষ অমন অকর্মণ্য!

চিনু সেদিন গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার আসিয়া প্রায় ঘণ্টা-দুই নীরদার সঙ্গে কাটাইয়া গেল। ভারি অমায়িক মেয়ে, এদিন সংসারের যত তরকারি, সব বঁটি পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কুটিয়া দিতে লাগিল, নীরদার কোনো বারণ শুনিল না। পাড়ার অন্য সকলের বাড়িতে চিনু তত যায় না, যত এখানে সে আসে। নীরদাকে তাহার কি যে ভাল লাগিল সে-ই জানে। দিনে অন্তত দুইবার তার এখানে আসাই চাই। নীরদারও তাহাকে বেশ ভাল লাগে।

দিন দশ বারো পরে একদিন শান্তিরাম স্ত্রীকে বলিল—শুনেছ, আমার অংশের দাম ধার্য হয়েছে বত্রিশ টাকা। আশা করি নি এত হবে। তা সবাই যে দর নিয়েছে আমিও তাই নিলাম।

নীরদা অবাক হইয়া বলিল—সে কি গো! ওই এক মজা ডোবা, বত্রিশ টাকাকরে অংশ হলে ছ-অংশের জন্য সুশান্তকে দুশো টাকা দিতে হবে?

—তা হবে বই কি। ঠাকুরদাদার নামে পুকুর পিরতিষ্ঠে করবার গরজ আছে—টাকা খরচ করবে না?

নীরদা গম্ভীর মুখে বলিল—একটা কথা বলি শোন। তুমি ও টাকা নিতে পারবে না। ছেড়ে দাও অমনি।

শান্তিরাম অবাক হইয়া বলিল—এমনি ছেড়ে দেব! কেন? বেশ তো তুমি—

নীরদা বলিল—চিনু আমাকে বড় ভালবাসে। এখানে ছাড়া সে কোথাও যায় না আসে না। দুটি চালভাজা দিই তাই হাসিমুখে বসে বসে খায়। মেয়ের মত মায়া হয়েছে ওর ওপর, ওদের কাছ থেকে তুমি এই ডোবা বেচে টাকা নিতে পারবে না—আর যে টাকা নেয্য নয়, তা কখনও নিতে পারবে না তুমি।

—তবে চলবে কি করে শুনি? এ টাকা ছাড়লে কিসে থেকে কি হবে?

—তা যাই হোক। ওরা বড়মানুষ বটে, কিন্তু গাঁয়ে সবাই ওদের ঠকিয়ে নিচ্ছে ছেলেমানুষ পেয়ে—তা বলে তুমি তা নিতে পারবে না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা আছে! তুমি নিলে আমি অনন্থ বাধাব বলে দিচ্ছি।

স্ত্রীকে শান্তিরাম ভয় করিত। কাজেই যখন অন্য সরিকেরা ডোবার অংশের দাম কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া পাইল, শান্তিরাম কিছুতেই টাকা লইল না। সুশান্তকে বলিল—পশুপতি দাদার ইচ্ছেতে তার বাবার নামে পুকুর হবে, আমি তাতে টাকা নিতে পারব না। এমনি লিখে দিচ্ছি আমার অংশ। ও অনুরোধ কোরো না বাবা।

রাত্রে সে স্ত্রীকে বলিল—কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি! তুমি টাকা নিতে দিলে না, এখন কর উপোস! বত্রিশ টাকায় দুটি মাস ভাবতে হতো না। এখন আমি কোথা থেকে কি করি, এই পুজো আসছে সামনে, অন্তত ওদের কাপড় কিনে দিতে পারতাম তো—

নীরদা বলিল—ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে টাকায় আমার ছেলেমেয়ের কাপড় কিনতে হবে না। ওরা কাপড় এবার না হয় পরবে না। যেমন চিনু তেমনি ওর দাদা—ওরা ছেলেমানুষ। ওদের কাছ থেকে দম দিয়ে অন্যায্য টাকা আদায় করে কদিন খাবে? বেশ করেছ ছেড়ে দিয়েছ।

টাকাটা হাতছাড়া হওয়াতে শান্তিরাম দুঃখিত হইল বটে কিন্তু স্ত্রীর এ নূতন মূর্তি তাহার কাছে লাগিল ভাল। সোনার বালার শোকে স্ত্রীর যে মূর্তি দেখিয়াছিল, ইহা তাহার বিপরীত; নীরদা—না, বেশ লোক! এ জিনিস যে আবার নীরদার মধ্যে আছে—

বলিল—শোন, ওপাড়ার মহেশদাদা তো এক শরিক। আমায় ডেকে পরশু বলছে—হ্যাঁ হে, তোমরা নাকি বত্রিশ টাকা করে অংশ ধার্য করেছ? আমি আমার অংশ পঞ্চাশ টাকার কমে দেব না। ওদের গরজ পড়েছে, বড়লোক, যা চাইবো তাই দিতে হবে। ও খাস ব্রহ্মোত্তর, ছাড়বো কেন অত সহজে? সত্যি যা বলেছ, সুশান্তকে ভালমানুষ পেয়ে ওরা দম দিয়ে বেশি টাকা আদায় করেছে।

—করে থাকে করেছে। যার ধর্ম তার কাছে। ও টাকা কদিন খেতে? ও কথা বাদদাও। পুকুর কাটিয়ে দেবে ওরা একগাদা টাকা খরচ করে কিন্তু জল খাবে পাড়ার পাঁচজনেই তো? ওরা সেই পশ্চিম থেকে কিছু পুকুরের জল খেতে আসছে না! আমাদের সুবিধের জন্যেই ওরা করে দিচ্ছে। চিনু বলেছিল, ওর দাদা পরের কাজে, দেশের কাজে বড় মন দিয়েছে। বেশ ছেলেটি।

পূজার দিনকয়েক বাকি।

সুশান্ত সন্ধ্যার সময় শান্তিরামের বাড়ি আসিল। বলিল—কাকা, আমরা কাল চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আপনার উপর একটা ভার দিয়ে যেতে চাই। পুকুর কাটানোর ভারটা আপনি নিন। গাঁয়ের মধ্যে আপনি অনেস্ট লোক দেখলুম। চিনুর মুখে আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি। একটা প্রস্তাব আছে আমার, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি। আমি এই পুকুর কাটানোর আর আমাদের জমিজমা বাড়িঘর এখানে যা আছে তা দেখাশুনা করবার জন্যে মাসে আপনাকে পনেরো টাকা দেবো। পুকুর কাটানো হয়ে গেলে আমাদের বাড়িটা মেরামত করবার ভারও আপনার ওপর থাকবে। আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে খালাস হবো। মাঘ মাসের দিকে মাকে নিয়ে এসে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে যাবো। বলুন কাকা, এতে আপনি রাজি আছেন—রাজি না হলে ছাড়ছি নে, গাঁয়ে আর লোক নেই। আর আমাদের যাওয়ার আগে আপনার দুমাসের টাকা দিয়ে যাবো—কেননা পুজো আসছে, খরচপত্র আছে তো? পুকুর-কাটার দরুনও আপাতত একশো টাকা আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই—আপনাকে সকলে গাঁয়ে বলে হোটেলওয়ালা বামুন, কিন্তু দেখছি আপনিই খাঁটি লোক।

শান্তিরামের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছোকরা আরও সব যে কি বলিয়া গেল শান্তিরামের মাথার মধ্যে কিছু ঢুকিল না। সুশান্ত চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কোথায় গেলে, শুনছো—শোন শোন—

—নীরদা সব শুনিয়া হাসিমুখে বলিল—স্ত্রীবুদ্ধি বলছিলে যে! আমার বুদ্ধি নিয়ে চলো একটু।